গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা | ২৪ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মানুষের কথা শুনছে না সরকার

জবাব বনধেই

সারা দেশ তৈরি হচ্ছে ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধ সফল করার জন্য। নয়া কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২১ প্রত্যাহারের দাবিতে এই বনধের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলির জোট 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বনধকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছে। দলের কর্মীরা প্রচারের কাজে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কৃষক ও শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠনগুলি, ছাত্র যুব মহিলা শিক্ষক অধ্যাপকদের সংগঠনগুলি, স্কিম ওয়ার্কারদের সংগঠন, ছোট ব্যবসায়ী, পরিবহণ শ্রমিকরা প্রায় সবাই এই বনধকে সমর্থন করেছে এবং সর্বাত্মক ভাবে সফল করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

বনধে একদিনের রুটি-রুজি বন্ধ হয় খেটে খাওয়া মানুষের। তবুও তাঁরা নিজেরাই কেন এই বনধ সফল করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সর্বশক্তি দিয়ে?

গত ৭৫ বছরে দেশের কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার যে মূল সমস্যা তার সমাধান কোনও সরকার করেনি। কৃষকদের দীর্ঘদিনের এই দাবি মানা দূরের কথা, বিজেপি সরকার গোটা কৃষি ব্যবস্থাটিকেই দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দিতে নতুন আইন নিয়ে এসেছে। একই সাথে বিদ্যুৎ আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনী এনে গোটা বিদ্যুৎ ব্যবস্থাটিকেও একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দিচ্ছে। এতে কৃষকরা যেমন একচেটিয়া পুঁজির ক্রীতদাসে পরিণত হবে তেমনই বিদ্যুতের দাম ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে।

এ ছাড়া বিজেপি সরকার রেল, তেল, গ্যাস, বিমান ও জাহাজ বন্দর, জাতীয় সড়ক, ব্যাঙ্ক, বিমা সহ সমস্ত জাতীয় সম্পদ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিষেবার বাড়তি খরচের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপবে। বিজেপি সরকারের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি এবং স্বাস্থ্যনীতির ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়ে ইতিমধ্যেই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার পণ্যে পরিণত হয়েছে। এ সব কিছুই বিজেপি সরকার একতরফা ভাবে দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, সাধারণ মানুষ কিংবা বিরোধীদের

দুয়ের পাতায় দেখুন

২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধের সমর্থনে উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি খেয়াতে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা প্রচার করছেন

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে

এসইউসিআই(সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিম্নলিখিত চিঠিটি দেন ঃ

নিম্নচাপের ফলে গত কয়েক দিনের টানা প্রবল বর্ষণে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বন্যার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পটাশপুর, পাঁশকুড়া, মাতঙ্গিনী ব্লক, নন্দীগ্রাম, নারায়ণগড়, ঘাটাল, হাওড়ার উলুবেড়িয়া, বাগনান, সাঁকরাইল এবং হুগলির উত্তরপাড়া, চুঁচুড়া, চন্দননগর ও আরামবাগ প্রভৃতি জায়গা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামনে ষাঁড়াষাঁড়ির কটাল এবং এ সপ্তাহের শেষে আবার ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। এর ফলে কোথাও বাঁধ ভেঙেছে, নদীর জল ঢুকেছে, পুকুর-খাল ভেসেছে, ফলে মাটির বাড়ি ভেঙেছে, সবজি, পান, ধান ও মাছ চাষের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, রাস্তা ভেঙেছে এবং এই সমস্ত জেলা আরও ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের দাবি ১) অবিলম্বে চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, ২) যাদের বাড়ি ভেঙেছে পুনর্নির্মাণের জন্য তাদের আর্থিক সাহায্য দিতে হবে, ৩) নদী বাঁধ যেখানে যেখানে ভেঙেছে তা অবিলম্বে শক্ত করে মেরামত করতে হবে।

ত্রাণে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

বন্যাপীড়িত এলাকাগুলিতে দুর্গত মানুষের ত্রাণের জন্য দলের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে ত্রাণ সংগ্রহ চলছে এবং দুর্গতদের মধ্যে তা বিলি করা হচ্ছে। কিছু জায়গায় রান্না করা খাবারও বিলি করা চলছে। উল্লেখ্য, সরকার ত্রাণের ঘোষণা করলেও অধিকাংশ দুর্গত মানুষের কাছে তা পৌঁছচ্ছে না। ত্রাণের দাবিতে দলের পক্ষ থেকে সরকারি দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন চলছে।

সন্তানের পাতে দুটো ভাত দিতে জেরবার মানুষ

বিজেপি সরকার ব্যস্ত মালিক তোষণে

সন্তানের পাতে ঠিকমতো দুটো ডাল-ভাত দিতে হলেও কপালে চিন্তার ভাঁজ আজ বহু মায়ের কপালে। ছেলেমেয়েরা আলুসেদ্ধতে এক ফোঁটা বেশি তেল চাইলেও অসহায় চোখে ফাঁকা শিশিটা দেখছেন কত সংসারের কর্তা-কর্ত্রীরা! বাজারে সরষের তেলের দামের ঝাঁঝ প্রতিদিন চোখের জল ঝরাচ্ছে। সরষের তেল ২০০ টাকায় পৌঁছেছে আগেই। তার ঊর্ধ্বগতির দৌড় বুঝিয়ে দিচ্ছে তা উঠবে আরও বহু দূর। অন্য ভোজ্য তেলের দামও আশেপাশেই ঘুরছে। চাল, ডাল, গম, আটা, মশলাপাতি, শাক সবজি থেকে মাছ-মাংস— কোনটার দাম আকাশছোঁয়া হয়নি? কষ্ট করে যদি কেউ সামান্য কিছু কিনেও আনেন, রান্নার গ্যাসটাও যে হাজার টাকার কাছাকাছি! কার কাছে যাবেন? কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি ব্যস্ত নিজের নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার সাফাই গাইতে। তাদের কাছে দরবার করে লাভ কী?

কিন্তু কেন এত অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি? দেশে কি কৃষিপণ্যের উৎপাদনে কোনও ঘাটতি দেখা দিয়েছে? তা হলে তো বাজারগুলোতে শাকসবজি, চাল-ডাল, আটা, সরষের তেলের আকাল দেখা দিত! তেমনটা কি ঘটেছে? বাজারে কোনও জিনিসের অভাব নেই, অভাব শুধু সেগুলো কেনার জন্য সাধারণ মানুষের হাতে পয়সার! তবে কি কৃষকরা তাঁদের উৎপাদন খরচের তুলনায় বাড়তি কিছু টাকা পাচ্ছেন? তা হলে তো দেশে হাজার হাজার কৃষককে আত্মহত্যা করতে হত না! তবে এই দাম বৃদ্ধি কেন?

এদিকে দেশের কৃষকরা সংযুক্ত কিসান মোর্চার

সাতের পাতায় দেখুন

২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধের সমর্থনে দিল্লিতে এআইকেকেএমএস-এর প্রচার

কালা কৃষি আইন, বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী-২০২১ বাতিলের দাবিতে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকা ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধের সমর্থনে দিল্লির সিংঘু বর্ডারে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে প্রচার করছেন কৃষকরা।১৭ সেপ্টেম্বর

বিজেপির কল্যাণে গোরু একটি ‘রাজনৈতিক’ প্রাণী!

সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শেখর কুমার যাদব বলেছেন, গোরক্ষা হিন্দুদের মৌলিক অধিকার। এমন কথা কোনও অজ্ঞ মূর্খ ধর্মান্ধ ব্যক্তি বললে তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। কিন্তু এমন কথা যখন কোনও হাইকোর্টের বিচারপতি বলেন, তখন বিষয়টি চিন্তার উদ্রেক করে বৈকি। ভাবতে অবাক লাগে খাদ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চাকরির অধিকার, চিকিৎসার অধিকার এসব আজ আর হিন্দুদের ‘মৌলিক অধিকার’ হিসেবে বিবেচিত হয় না।

বিচারপতি যাদব নিশ্চয়ই সংবিধান পড়েছেন। ‘মৌলিক অধিকার’ বলতে কী বোঝায় তিনি তা জানেন না, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ছয়টি মৌলিক অধিকারের স্বরূপ দেখলেই বোঝা যায়, যে অধিকারের অস্তিত্বহীনতায় নাগরিকের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়, সেই অধিকারগুলোই মৌলিক অধিকার। সেক্ষেত্রে কর্তাভজা ছাড়া আর কোন যুক্তিতে গোরক্ষা মৌলিক অধিকারের তালিকায় স্থান পেতে পারে বোঝা দায়।

ছোটবেলায় ছাত্রছাত্রীদের রচনা লেখার মতো বিচারপতি যদি বলতেন, গোরু উপকারী জীব, গোরুর দুধ-গোবর-চামড়া মানুষের কাজে লাগে। তাহলে কোনও প্রশ্ন ছিল না। গোরুর দুধে সোনা পাওয়া যায়, এমন কৌতুকে আমোদ প্রকাশ না করেও গোরুর উপকারিতা রচনাটিকে আরও সমৃদ্ধ করা যায় একথা যুক্ত করে যে, গরুর মাংসও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বেশ কিছু রাজ্যে গোমাংস অন্যতম খাদ্য। ইতিহাস চর্চায় জানা যায়, একসময় বৈদিক ঋষিরাও গোমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিলেন।

ইতিহাস এ কথাও বলে, যে কোনও কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির সাথে যুক্ত পশু একটা বিশেষ কদর পায়। সে হিসেবে এদেশে! গোরুও কদর পায়। কিন্তু আজ কৃষিতে হাল-বলদের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। সেক্ষেত্রে গোমাতার যে সন্তানেরা গোরুকে উপকারী জীব থেকে ‘সাম্প্রদায়িক জীবে’ পরিণত করেছে, তাদের গোরুর প্রতি প্রকৃতই যে কোনও দরদবোধ নেই, তা উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের গোশালাগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এদেশে গোরক্ষার নামে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করা যায়, আবার গোরু জবাই বন্ধ করে বিদেশে গোরু চালান দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করা যায়। ফলে বিজেপি-আরএসএস গোরু বা কোনও ধর্মের প্রতি ভক্তি থেকে নয়, তাদের নোংরা রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে গোরুকে প্রচারের ইস্যু করে।

এ একরকম বোঝা যায়, কিন্তু একজন হাইকোর্টের বিচারপতি যখন যুক্তিহীন অন্ধ ধর্ম-ব্যবসায়ীদের সুরে কথা বলেন, তখন সামাজিক সংকটকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করা হয়। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কখনও বিচারব্যবস্থা চলতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়ের ভাবাবেগকে ভিত্তি করে আইনের বিচার হলে তা ন্যায়বিচার হতে পারে না। জীব রক্ষা করার অজুহাতে মানুষের জীবনের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষা করার দায় বা দায়িত্ব নেই, ‘নিরপেক্ষ’ বিচারপতিরও কি নেই?

বিচারপতি যাদব আরও বলেছেন, ‘গোরু ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ, সরকারের উচিত সংসদে বিল এনে গোরুকে জাতীয় পশু ঘোষণা করা।’ শুধু এলাহাবাদ হাইকোর্ট নয়, চার বছর আগে এমন পরামর্শ দিয়েছিল রাজস্থান হাইকোর্টও। বিচারপতি মহেশচন্দ্র শর্মা গোরুকে ‘মাতা’ বলে বর্ণনা করে বলেছিলেন, ‘গোহত্যার চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছুই হতে পারে না।’ সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল, এ অপরাধ কি মানুষ হত্যার চেয়েও বড়? আসলে, বারবার এ হেন মন্তব্যে বিচারকদের নিরপেক্ষতা নিয়েই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। বিজেপি-আরএসএসের মার্গদর্শনকারী হিন্দুত্ববাদী নেতাদের ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’র ব্যাখ্যার সুরে সুর মিলিয়ে বিচারপতিদের কথাগুলো শুনতে শুনতে তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক কি? হিন্দু আচার, হিন্দু বিশ্বাস পালনই যে ভারতীয় সংস্কৃতি, এ তো ইতিহাসের অপলাপ, বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়! ভারত শুধুমাত্র সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ নয়, এ দেশ বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, ভগৎ সিং, নেতাজির পথ বেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শকে বহন করে। সেদেশে হিন্দু ধর্ম-সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্কৃতিই একমাত্র সংস্কৃতি, এ বিশ্বাস জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। চিন্তায় ও কর্মে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে না পারলে, তা মনুষ্যত্বের অবমাননা। এর দায় তথাকথিত ‘নিরপেক্ষ’ বিচারপতিরাও এড়িয়ে যেতে পারেন না।

ফুলচাষিদের ক্ষতিপূরণের দাবি

সাম্প্রতিক বন্যা ও অতিবর্ষণে পদ্ম সহ সমস্ত ফুলচাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত বছর থেকে চলতে থাকা লকডাউনে ফুলচাষিরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’-এর প্রভাবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ বেশ কয়েকটি জেলার ফুলচাষ একেবারে নষ্ট হয়েছিল। ফুলচাষিরা ঋণ নিয়ে চাষ শুরু করলেও সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ ও বন্যার জেরে ফুলের বাগান ও নার্সারিগুলি সব জলের তলায় চলে গিয়েছে। শারদীয়া মরশুম সহ আগামী কয়েক মাস পদ্ম সহ সমস্ত ধরনের ফুলের যোগান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নূতন করে চাষে সরকারি সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। এই অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত ফুলচাষিদের অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূণের দাবিতে ২০ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হর্টিকালচার দপ্তরের মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

জবাব বনধেই

একের পাতার পর

মতামতের কোনও গুরুত্ব না দিয়েই তারা সরকারি ক্ষমতার জোরে এ কাজ করে চলেছে। সরকারের এই ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি।

অন্য দিকে সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদকে মূল্য দেওয়ার মতো ন্যূনতম গণতান্ত্রিক বোধ বিজেপি সরকারের নেই।

নতুন কৃষি আইনের মারাত্মক পরিণতি উপলব্ধি করে কৃষকরা তা প্রত্যাহারের দাবিতে গত নভেম্বর থেকে দশ মাস ধরে দিল্লি বর্ডারের নানা জায়গায় অবস্থান-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা ট্রাক্টর নিয়ে বারবার মিছিল করেছেন, রাজ্যে রাজ্যে মহাপঞ্চায়েতের আয়োজন করে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। কিন্তু সরকার কয়েক দফা আলোচনার প্রহসন ছাড়া আর যা করেছে তা হল কৃষকদের নামে কুৎসা— খালিস্তানি, পাকিস্তানি প্রভৃতি নামে দাগিয়ে দেওয়া। এই অবস্থায় শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ বিজেপি সরকারের একতরফা আক্রমণের সামনে পড়ে যখন খানিকটা দিশেহারা হয়ে ভাবছিল এই আক্রমণকে কি রোখা যাবে, নাকি পড়ে পড়ে শুধু মারই খেতে হবে, ঠিক তখনই দেশজুড়ে আওয়াজ উঠল— সরকার যখন কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী, সাধারণ মানুষ কারও কথা শুনবে না, কোনও দাবিতে কর্ণপাত করবে না, তখন ধর্মঘট ছাড়া উপায় কী!

যে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল, মার খাওয়াটাকে ভবিতব্য বলে যারা ধরে নিয়েছিল, এই ভারত বনধের কর্মসূচি আসলে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। যে শ্রমিক, যে কৃষক, যে সাধারণ মানুষ ভাবছিল আক্রমণটা শুধু তার উপরেই, এ আক্রমণ সে একা কী করে রুখবে, ২৭ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের ডাক তাকে দেখিয়ে দিল, আক্রমণটা শুধু তার একার উপর নয়, তাই প্রতিরোধেও সে একা নয়, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে শ্রমজীবী মানুষ তারই মতো বনধের শরিক হতে এগিয়ে আসছে। তাদের উদ্দেশ্য গোটা দেশ স্তব্ধ করে দিয়ে, উৎপাদনকে এক দিনের জন্য স্তব্ধ করে দিয়ে সরকারের টনক নাড়িয়ে দেওয়া যে, সরকার কিংবা একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যত ক্ষমতাশালীই হোন, দেশের মানুষ এই সব কালা আইন মেনে নেবে না।

বনধ কিংবা ধর্মঘট মালিকদের, আর তাদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার সরকারকে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতার একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। একটা ধর্মঘট মেহনতি মানুষকে বুঝতে শেখায় মালিকদের শক্তির উৎস কী, শোষিত মানুষের শক্তির উৎসই বা কোথায়। শোষিত মানুষ বুঝতে পারে ধর্মঘটে কাজ করতে অস্বীকার করার দ্বারা তারা সমস্ত উৎপাদন যন্ত্রকেই অচল করে দেওয়ার শক্তি ধরে। ধর্মঘট শোষিত মানুষকে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে, বুঝতে শেখায়— মালিকরা যতই অর্থ, সম্পদ, উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হোক না কেন, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের শ্রম ছাড়া সে-সবই মূল্যহীন, তা থেকে কোনও মুনাফাই আসবে না। ধর্মঘট প্রতিটি খেটে খাওয়া মানুষকে মনে করিয়ে দেয়, তারা একা নয়, তারা রয়েছে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে তারা প্রত্যক্ষ করে, অনুভব করে। হতাশা কাটিয়ে আত্মশক্তিতে তারা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

মালিকি শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা মিছিল, মিটিং, সমাবেশের মতো আন্দোলনের পদ্ধতিগুলিকে মালিকরা উপেক্ষা করার ভান করতে পারে, আন্দোলনকারীদের সাথে সরকারের মন্ত্রী-আমলারা দেখা না করতে পারেন, দাবি পূরণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, দেখছি-দেখব করে কালহরণ করতে পারেন, কিন্তু ধর্মঘটকে তাঁরা এভাবে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কারণ, একটা মিছিল বা সমাবেশ যত বড়ই হোক, তাতে সামিল হয় ঐ দাবির সঙ্গে যুক্ত মোট জনসংখ্যার একাংশ। একমাত্র ধর্মঘটই দাবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশের মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত করে নিতে পারে। তাই বনধ বা ধর্মঘট হল সংগ্রামের একটা উচ্চতর হাতিয়ার। এদেশের মানুষ দেখেছে কীভাবে গরিব ঘরের সন্তানদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার অধিকার ফিরে পেতে সাহায্য করেছে ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির বাংলা বনধ।

ভারত বনধ নিয়ে কোনও প্রচার সংবাদমাধ্যমে নেই। প্রচারমাধ্যমগুলির পিছনে কাজ করে মালিকদেরই বিপুল পরিমাণ পুঁজি। এগুলির মালিক তারাই। বনধ সম্পর্কিত প্রচারে তাই এই মাধ্যমগুলি চিরকাল একতরফা মনগড়া এবং বিকৃত প্রচার করে। ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

আবার কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো তথাকথিত বিরোধী দলগুলিকেও এই বনধ চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে। নির্বাচনী স্বার্থে এই দলের নেতারা সব সময়ই গরিব মানুষের, শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থরক্ষার কথা বলে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের হয় সরাসরি বনধের বিরোধিতা করে মালিকদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে, না হয় শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের দাবিগুলির পক্ষে দাঁড়াতে হবে। আবার সিপিএমের মতো বামনামধারী দলগুলি যারা মুখে হলেও দাবিগুলিকে সমর্থন করছে, তারাও দাবি আদায়ে কতটা সিরিয়াস, কতটা দায়বদ্ধ তা বনধ সফল করার প্রশ্নে তাদের ভূমিকার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মেহনতি মানুষের পক্ষে এদের চিনে নেওয়াও অনেক সহজ হবে।

বনধে প্রতিফলিত বিপুল জনমত থেকে সরকার যদি শিক্ষা না নেয়, আরও শক্তিশালী, আরও ব্যাপক মানুষের সংঘবদ্ধ রূপ সংগ্রামের হাতিয়ার গড়ে তুলে সারা দেশব্যাপী প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠবে। পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রয়োজনবোধ জীবন্ত হয়ে সংগ্রামের আর এক নতুন অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হবে।

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় ‘মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব’ নিবন্ধটি প্রকাশ করা গেল না।

মার্কিন দখলদারি আফগানিস্তানকে দিয়েছে ধ্বংস আর নৈরাজ্য

আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নানা ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘদিন লড়াই করে যাচ্ছে 'রেভোলিউশনারি আফগান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া)। তালিবান এবং মার্কিন দখলদারির মধ্যে বহু বাধা অতিক্রম করে তাঁরা লড়ছেন। সম্প্রতি কাবুলে তালিবান অধিকার প্রতিষ্ঠার পর ২১ আগস্ট রাওয়ার এক প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেন 'আফগান উইমেন্স মিশন'-এর কো-ডাইরেক্টর সোনালি কোলহাটকর। সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ আমরা প্রকাশ করছি।

প্রশ্ন ঃ মার্কিন সেনা কি এর থেকে ভাল এবং সুরক্ষিত অবস্থায় আফগানিস্তানকে রেখে যেতে পারত না? তালিবান যাতে এত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দখল করতে না পারে তার ব্যবস্থা কি প্রেসিডেন্ট বাইডেন করতে পারতেন না?

রাওয়া ঃ আমরা বিগত ২০ বছর ধরে আমেরিকা ও ন্যাটোর দখলদারি বন্ধ করার দাবি জানিয়ে এসেছি। সবচেয়ে ভাল হত যাবার সময় যদি ওরা ওদের সৃষ্ট মুসলিম মৌলবাদী এবং আমলাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলে। তাহলে আমাদের জনগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা গড়ে নিতে পারত। মার্কিন দখলদারি আফগানিস্তানকে কেবলমাত্র রক্তপাত, ধ্বংস আর বিশৃঙ্খলা উপহার দিয়েছে। ওরা আমাদের দেশটাকে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, বিপদসংকুল, ড্রাগ মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য আর মহিলাদের জন্য বিপজ্জনক এক স্থানে পরিণত করে গেছে।

২০০১-এর অক্টোবর মাসে মার্কিন দখলদারির শুরুর দিনগুলি থেকেই আমরা এই আশঙ্কার কথা বলে যাচ্ছি। আমরা বলেছিলাম, মার্কিন আক্রমণ যদি চলতে থাকে এবং তাতে নিরীহ অসামরিক মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলে, তা তালিবানের পক্ষেই জমি তৈরি করবে। একই সাথে তা আফগানিস্তানের পাশাপাশি সারা দুনিয়া জুড়ে মৌলবাদী শক্তিগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

আমরা এই দখলদারির বিরুদ্ধতা করেছি তার প্রধান কারণ— তা ছিল সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের চটকদার ঘোষণার আড়ালে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা। দখলদারির একেবারে প্রথম দিকে ২০০২ সালে শান্তি আলোচনার নামে 'নর্দান অ্যালায়েন্সের' খুনে এবং লুটেরাদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, আবার এই শেষ পর্বে ২০২০-২১-এ দোহায় শান্তি আলোচনার নামে বোঝাপড়ার চুক্তি করে ৫ হাজার সন্ত্রাসবাদীকে জেলমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এর থেকে একটা বিষয় নিশ্চিত বোঝা যায়, এই সেনা প্রত্যাহার ভাল কিছু দিয়ে যাচ্ছে না।

পেন্টাগন প্রমাণ করে দিয়েছে, যে বুকনির আড়ালেই হোক না কেন, অন্য দেশ আক্রমণ এবং তার শাসন ব্যবস্থায় নাক গলানোর মধ্য দিয়ে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া যায় না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দেশে দেশে আক্রমণ চালায় তাদের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতলব হাসিল করতে। সব ক্ষেত্রেই তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মতলবকে আড়াল করতে শক্তিশালী কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম একটানা প্রচার চালিয়ে যায়।

শুনলে হাসি পায় যে, নারীর অধিকার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জাতি গঠন প্রভৃতি নাকি ছিল মার্কিন ন্যাটো বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য! আমেরিকা আফগানিস্তানে ঢুকেছিল এই এলাকাকে অস্থির করে তুলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী চিন এবং রাশিয়াকে সন্ত্রাসবাদের ঘেরাটোপের মধ্যে ফেলতে। আঞ্চলিক যুদ্ধে ফাঁসিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অর্থনীতির উপর চাপ বাড়াতে। ...

আমরা বিশ্বাস করি নিজেদের আজ্ঞাবহ শক্তির (তালিবান) কাছে হেরে নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের নিজস্ব দুর্বলতার কারণেই আফগানিস্তান ছেড়েছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর পিছনে আছে— প্রধান কারণ আমেরিকা আজ বহুমুখী অভ্যন্তরীণ সংকটের কবলে। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় দুর্বলতা মার্কিন ব্যবস্থার ক্ষয়কে প্রকট ভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। ক্যাপিটাল হিলে হাঙ্গামা, আমেরিকা জুড়ে বিগত কয়েক বছরে সংগঠিত গণপ্রতিবাদ ইত্যাদি যে আভ্যন্তরীণ সংকটকে তুলে ধরেছে তার ফলে মার্কিন নীতি নির্ধারকরা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বেশি মন দেওয়ার প্রয়োজনে আপাতত সেনা প্রত্যাহারের দিকে গেছেন।

দ্বিতীয়ত, আফগান যুদ্ধের খরচ হয়েছে ট্রিলিয়ন ডলারের হিসাবে। যা নজিরবিহীন। এর পুরোটাই এসেছে করদাতাদের ঘাড় ভেঙে। এই খরচ মার্কিন অর্থব্যবস্থায় ভালই দাঁত বসিয়েছে। ফলে আফগানিস্তান থেকে তাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে।

মার্কিন যুদ্ধবাজদের নীতি দেখিয়ে দিয়েছে কখনওই আফগান জনগণের নিরাপত্তার জন্য তাদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না, এমনকি ছেড়ে যাওয়ার সময়েও তারা তার প্রমাণ রেখে গেছে। তারা ভালই জানত এই সেনা প্রত্যাহারে বিশৃঙ্খলা ঘটবে, এবং তারা সেভাবেই এগিয়েছে। এখন আফগানিস্তান আবার প্রচারের আলোয়, কারণ তালিবান ক্ষমতায় এসেছে। যদিও, বিগত ২০ বছর ধরে এই পরিস্থিতিই চলছে। প্রতিদিন আমাদের দেশের শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, দেশটা প্রতিদিন ধ্বংস হয়েছে। এর খুব সামান্য অংশই সংবাদমাধ্যমে স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন ঃ তালিবান নেতৃত্ব বলছে, ইসলামি আইন অনুসারে যতদূর সম্ভব ততদূর তারা মহিলাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। কিছু পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম বিষয়টিকে সদর্থক ভাবে দেখাচ্ছে। ২০ বছর আগেও কি তালিবান এসব বলেনি? আপনারা কি মনে করেন, মানবাধিকার এবং নারীর অধিকারের প্রশ্নে তাদের কোনও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন হয়েছে?

রাওয়া ঃ কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম বিপন্ন মানুষের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে। ওরা যে ভাবে চিনিমাখা প্রলেপ দিয়ে বর্বর তালিবানকে উপস্থিত করছে, ওদের উচিত ছিল নিজেদের কাছেই লজ্জা পাওয়া। তালিবান মুখপাত্ররা পরিষ্কার ঘোষণা করেছে ১৯৯৬ থেকে আজ পর্যন্ত তাদের নীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। আজ মহিলাদের অধিকার নিয়ে তারা যা বলছে, তা তাদের পূর্বতন অন্ধকার জমানার কথাগুলির সাথে হুবহু মিলে যায়। সে সময়েও তারা শরিয়তি আইন প্রবর্তনের কথাই বলেছিল।

তালিবান এখন আফগানিস্তান জুড়ে ক্ষমা ঘোষণা করে স্লোগান দিচ্ছে, 'প্রতিশোধে নয়, ক্ষমাতেই আনন্দ'। কিন্তু বাস্তবে তারা প্রতিদিন মানুষ খুন করছে। গতকালই তারা একটি বালককে গুলি করে খুন করেছে, কারণ তার হাতে ছিল ত্রিবর্ণ আফগান জাতীয় পতাকা, তালিবানের সাদা পতাকা নয়। কান্দাহারে তারা চারজন প্রাক্তন সেনা অফিসারকে খুন করেছে। ফেসবুকে তালিবান বিরোধী কবিতা লেখার জন্য হেরাট প্রদেশে তরুণ আফগান কবি মেহরান পোপালকে তারা গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর কোনও খোঁজ পরিবার পায়নি। 'মনোরম' পরিশিলিত আচরণের আড়ালে এই হল তাদের হিংস্র কার্যকলাপের কয়েকটি উদাহরণ।

... তালিবান বলছে ওরা মহিলাদের অধিকারের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু তা শরিয়া আইনের পরিধির মধ্যে থাকতে হবে।

শরিয়া আইন ব্যাপারটাই ঘোলাটে, নানা সময় নানা ইসলামিক শাসক তাদের রাজনৈতিক এবং শাসনগত সুবিধার জন্য তার নানা ব্যাখ্যা দিয়েছে। তাছাড়া তালিবান চাইছে, পশ্চিমি শক্তিগুলির কাছে গুরুত্ব পেতে ও স্বীকৃতি আদায় করতে। তাই এই সব কথা দিয়ে নিজেদের আসল চেহারার উপর একটা সাদা প্রলেপ দিতে চাইছে। এমনও হতে পারে কিছু মাস পরে ওরা বলল, আমরা ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাই আমরা নির্বাচন করব! এই সমস্ত ভান তাদের কোনও চরিত্রকেই পাল্টে দেয় না। ওরা একই রকমভাবে ইসলামিক মৌলবাদী, নারীবিদ্বেষী, অমানবিক, বর্বর, প্রতিক্রিয়াশীল, গণতন্ত্র বিরোধী, প্রগতি বিরোধী হয়েই আছে। এক কথায়, তালিবান মানসিকতা পরিবর্তন হয়নি, কোনও দিন তা হবেও না।

প্রশ্ন ঃ মার্কিন মদতপুষ্ট আফগান সরকার এবং সরকারি সেনাবাহিনী এত দ্রুত ভেঙে পড়ল কেন?

রাওয়া ঃ অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—

১) তালিবানের হাতেই আফগানিস্তানকে তুলে দেওয়া নিয়ে বোঝাপড়া হয়েছে, সেই অনুসারেই সব চলেছে। পাকিস্তান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পক্ষগুলির সাথে বোঝাপড়া করেই মার্কিন সরকার মূলত তালিবানকে সামনে রেখে আফগানিস্তানে সরকার গড়ার চুক্তি করেছে। আফগান সরকারি সৈন্যরা জানত, এই যুদ্ধে আফগান জনগণের কোনও লাভ নেই। কারণ তালিবানকে ক্ষমতায় বসানোর চুক্তি বন্ধ দরজার পিছনে হয়েই আছে। ফলে তারা এমন একটা যুদ্ধে প্রাণ দিতে ইচ্ছুক ছিল না।...

২) বেশিরভাগ আফগান জনগণ বোঝেন, আফগানিস্তানে যে যুদ্ধে চলছে, তা আফগানদের যুদ্ধ নয় এবং এতে দেশের কোনও ভালও হবে না। বিদেশি শক্তিরা তাদের সামরিক কৌশলগত স্বার্থে এই যুদ্ধ চালাচ্ছে, আফগানরা এর জ্বালানিমাত্র। বেশিরভাগ যুবক সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র এবং বেকারত্বের জন্য। ফলে তাদের যুদ্ধ করার জন্য কোনও মানসিক শক্তি কিংবা দায়বদ্ধতা নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ২০ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমি দেশগুলি আফগানিস্তানে শিল্প গড়ে ওঠায় বাধা দিয়েছে। যাতে আফগানিস্তানকে উপভোক্তা বানিয়েই রাখা যায়। তাতে বেকারত্ব এবং দারিদ্রের ঢেউ দেশকে গ্রাস করেছে। এর ফলে পুতুল সরকার তাদের কাজের লোক পেয়েছে। তালিবানের বৃদ্ধি এবং আফিম উৎপাদনেও তা সাহায্য করেছে।

৩) সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ভেঙে পড়ার মতো দুর্বল শক্তি আফগান বাহিনী ছিল না। কিন্তু তালিবান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত না করা এবং আত্মসমর্পণ করার আদেশ তারা পাচ্ছিল রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ থেকেই। ...

৪) হামিদ কারজাই এবং আশরাফ গনির পুতুল সরকার বছরের পর বছর তালিবানকে 'অসন্তুষ্ট ভাই' বলে ডেকে এসেছে। তাদের বহু চরম নিষ্ঠুর সেনাপতি এবং নেতাকে সরকার জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ...এর ফলে তালিবান শক্তি পেয়েছে, সেনাবাহিনীর মনোবল ধাক্কা খেয়েছে।

৫) আফগান সশস্ত্র বাহিনীর নজিরবিহীন দুর্নীতিতে জর্জরিত। বেশ কিছু জেনারেল (যারা বেশিরভাগই নির্মম নর্দান অ্যালায়েন্সের প্রাক্তন যুদ্ধ-সেনাপতি) কাবুলে বসেই লক্ষ লক্ষ ডলার কামিয়েছে। তারা ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধরত সেনাদের খাদ্য এবং বেতনও পকেটে পুরেছে। 'সিগার' (স্পেশ্যাল ইনসপেক্টর জেনারেল ফর আফগানিস্তান রিকন্সট্রাকশন) দেখিয়েছে, সেনা বহিনী 'ভুয়ো' সৈনিকে ভরা। উচ্চপদস্থ অফিসাররা নিজেদের পকেট ভরাতেই ব্যস্ত থেকেছে। অস্তিত্বহীন সেনাকর্মীদের বেতন, রেশন ইত্যাদি এদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই ঢুকেছে।

৬) কোথাও কঠিন যুদ্ধে সেনারা তালিবানের হাতে বন্দি হলে তাদের সাহায্যের আবেদন কাবুল অগ্রাহ্য করেছে। এমন প্রচুর ঘটনা আছে যেখানে শত শত সৈন্যকে কোনও অস্ত্র এবং খাদ্য ছাড়াই সপ্তাহের পর সপ্তাহ পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকতে অফিসাররা বাধ্য করেছে। যার সুযোগে তালিবান শত শত সৈনিককে হত্যা করেছে। সে জন্যই আফগান সেনাদের মৃত্যুর হার এত বেশি। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামে (ডাভোস ২০১৯) আশরাফ গনি স্বীকার করেছিলেন ২০১৪ থেকে ৪৫ হাজারের বেশি আফগান সেনাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। যেখানে একই সময় মার্কিন-ন্যাটো জোটের মাত্র ৭২ জন সেনা প্রাণ হারিয়েছেন।

৭) সর্বোপরি সমাজে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, অবিচার, বেকারত্ব, নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা, জালিয়াতি, বিপুল দারিদ্র, ড্রাগ পাচার এবং স্মাগলিং ইত্যাদি তালিবানের পুনরুত্থানে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন ঃ রাওয়া ও আফগান জনগণকে নারীর অধিকারের প্রশ্নে সাহায্য করার জন্য মার্কিন

সাতের পাতায় দেখুন

রাস্তা সারানোর দাবিতে অবরোধ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়ক সংলগ্ন জানুবসান বাজার থেকে সাবলআড়া সীমা পর্যন্ত

প্রায় আড়াই কিমি ঢালাই রাস্তা করার জন্য ২০১৭ সালের ১৭ জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলান্যাস করেছিলেন। সেই ফলক এখনও রাজ্য সড়কের পাশে পড়ে থাকলেও রাস্তার কোনও কাজ হয়নি। ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বেশ কয়েকটি গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ যাতায়াত করেন। রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য। বর্ষার সময় তা আরও বিপজ্জনক হয়ে যায়। রাস্তাটি অবিলম্বে ঢালাই করার দাবিতে ১৮ সেপ্টেম্বর জানুবসান, প্রসাদচক, সাবল আড়া সহ সংশ্লিষ্ট গ্রামের পাঁচ শতাধিক অধিবাসী নোনাকুড়িতে এক ঘণ্টার বেশি রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশের যথাযথ ব্যবস্থার আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। নেতৃত্ব দেন স্বপন সামন্ত, প্রশান্ত ঘড়া, সোমনাথ ভৌমিক প্রমুখ।

নদীয়ায় শিক্ষা কনভেনশন

১৮ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর পৌরসভায় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল মঞ্চে সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবিতে সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা কনভেনশন হয়। শুরুতে এই শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে প্রস্তাব পাঠ করা হয়। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক মানস জানা। বক্তব্য রাখেন সহ সম্পাদক ডঃ মৃদুল দাস, তাহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জয়দেব মুখার্জি প্রমুখ।

বক্তারা প্রত্যেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এই শিক্ষানীতি যে শিক্ষায় বেসরকারিকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণে নীল নকশা তা বলেন। শিক্ষার মূল লক্ষ্য চরিত্র গঠন ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তা এই শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হবে ফলে শিক্ষা বাঁচাতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কনভেনশনে সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিবশঙ্কর পালকে সভাপতি এবং প্রাক্তন শিক্ষক হররোজ আলি শেখকে সম্পাদক করে সেভ এডুকেশন কমিটির নদীয়া জেলা শাখা গঠিত হয়।

কলকাতা জেলা শিশু-কিশোর উৎসব

কমসোমলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কলকাতা জেলা তৃতীয় শিশু-কিশোর উৎসব। ২৯ আগস্ট

উদ্বোধন করেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। এক সপ্তাহ ধরে অনলাইনে চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা, সঙ্গীত, নৃত্য ও শ্রুতি নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় চার শতাধিক শিশু-কিশোর। ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান। বিভিন্ন কিশোর ব্রিগেড থেকে সদস্যরা নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে। বিচারকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বার্তা রাখেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্র পরিচালক ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ দেন কমসোমলের কলকাতা জেলা সাংগঠনিক কমিটির ইনচার্জ কমরেড বাপি হালদার। প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণার আগে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী। দুই শতাধিক শিশু-কিশোর এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ বাতিলের দাবি

১৪ সেপ্টেম্বর সেভ এডুকেশন কমিটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে তমলুকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মাধ্যমে শিক্ষার সর্বাত্মক বেসরকারিকরণ ও

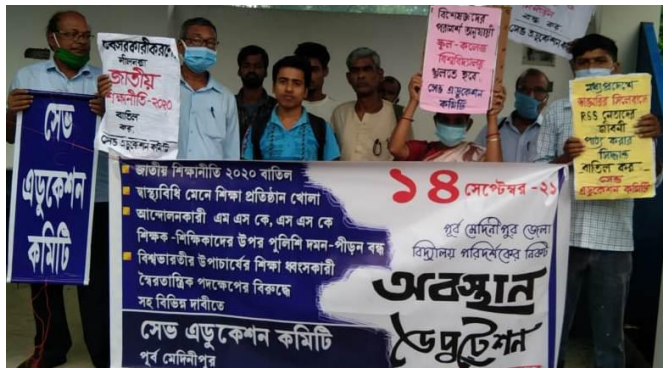

কর্পোরেটকরণ, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর পরিকল্পনা, ব্লেন্ডেড মোড অফ এডুকেশনের মাধ্যমে শিক্ষাকে পুরোপুরি অনলাইন ভিত্তিক করা, মাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দেওয়া সহ বিভিন্ন প্রস্তাব করা হয়েছে। ডেপুটেশনে এর বিরোধিতা করা হয়। দাবি জানানো হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে হবে। এমএসকে-এসএসকে শিক্ষকদের ওপর রাজ্য সরকারের অমানবিক ও নির্মম অত্যাচার বন্ধ করতে হবে এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্যের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। নেতৃত্ব দেন শুভেন্দু শেখর দাস, আব্দুল মাসুদ, বাসুদেব দাস, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রমুখ।

কন্ট্রাক্টচ্যুয়াল ব্যাঙ্ক কর্মী সম্মেলন

১২ সেপ্টেম্বর কন্ট্রাক্টচ্যুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট জননেতা কমরেড তপন ভৌমিক। প্রধান বক্তা ছিলেন ফোরামের সভাপতি কমরেড জগন্নাথ রায় মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন, কমরেডস সামসের আলি, বিজয় লোধ, গোপাল দেবনাথ, প্রহ্লাদ দেবনাথ প্রমুখ। সাধারণ সম্পাদক কমরেড নারায়ণ পোদ্দারের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করে শোনানো হয়। কমরেড রাজকুমার চৌধুরী সভাপতি, কমরেজ বিজয় লোধ সম্পাদক, কমরেড মিন্টু রায়কে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

হাওড়ায় মিড ডে মিল কর্মীদের দাবি আদায়

মিড ডে মিল কর্মীরা মাসে মাত্র ১৫০০ টাকা পায়, সেটাও বছরে মাত্র ১০ মাস। মিড ডে মিল

কর্মীদের কোনও সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হয় না।

এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে ৬-১২ সেপ্টেম্বর দাবি দিবস পালন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে ৬ সেপ্টেম্বর মিছিল করে শ্যামপুর মোড়ে পথ অবরোধ করেন মিড ডে মিল কর্মীরা। পরে হাওড়া

গ্রামীণ জেলা সম্পাদিকা সাগরিকা বর্মনের নেতৃত্বে শ্যামপুর-১ বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১০ সেপ্টেম্বর মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল উলুবেড়িয়া শহর পরিক্রমা করে। পরে ভক্তার মোড়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান-বিক্ষোভ চলে। জেলা নেত্রী মমতা মণ্ডল, অশোকা ধোলে, সাহানারা বেগম ও মিনতি সিং-এর এক প্রতিনিধি দল উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ সরকারী কর্মীর স্বীকৃতি, মাসিক ২১ হাজার টাকা হারে বছরে ১২ মাসের বেতন, বকেয়া মেটানো, কোভিড ভ্যাকসিন, বিদ্যালয় খোলা সহ বিভিন্ন দাবিতে ৬-১২ সেপ্টেম্বর দাবি সপ্তাহ পালন করা হয়। বারাসত-১, বাগদা, গাইঘাটা, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর ব্লকে শয়ে শয়ে কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন ও সংশ্লিষ্ট বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেন। বকেয়া পাওনা, ভ্যাকসিন সহ বেশ কিছু স্থানীয় দাবি আদায় হয়েছে।

আফগানিস্তানে চলছে খাদ্যের হাহাকার

কোলের ছেলেটাকে কী খেতে দেবেন কিছুতেই বুঝতে পারছেন না মা। হাতে তো কিছুই নেই, কী দিয়ে কিনবেন খাবার? অবশেষে ঘরে থাকা আসবাবপত্র, গৃহস্থালীর নানা সরঞ্জাম, বাসনপত্র নিয়ে বাজারে গেলেন বিক্রি করতে। যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে কিছু দিন হলেও যদি সংসার চলে!

কাবুল ও তার সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু রাস্তায় এরকম 'বাজার' তৈরি হয়েছে, যেখানে এমন সব মানুষেরা প্রতিদিন বিক্রি করতে আসছেন সংসারের টুকিটাকি পর্যন্ত। এমনভাবেই দারিদ্রের সাথে লড়াই করছেন আফগানিস্তানের অসংখ্য মানুষ। একদিকে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা অন্যদিকে খাদ্যের জন্য হাহাকার তাদের প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তালিবান জমানায় সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা এমন পর্যায়েই পৌঁছেছে।

মার্কিন সেনাদের হামলায় গত ২০ বছরে কয়েক লক্ষ সাধারণ আফগানের প্রাণ গিয়েছে। বহু পরিবারের পুরুষেরা হয় মারা গিয়েছেন না হলে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। মহিলাদের উপর বাড়ির শিশু এবং বয়স্কদের দেখভালের দায়িত্ব এসে পড়েছে। এদিকে তালিবানি শাসনে ভেঙে পড়েছে অর্থনীতি। মহিলারা কাজে যেতে পারছেন না। প্রায় দিনই কাজে যাওয়ার দাবি জানিয়ে মিছিল করছেন মহিলারা। আগের শাসনে কর্মরত মানুষরা তালিবান শাসনে কাজে যেতে ভয় পাচ্ছেন। ফলে বিরাট সংখ্যক মানুষের রোজগার নেই। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি। উপরন্তু গত কয়েক বছর ধরে (২০১৮-১৯) লাগাতার খরায় দেশে খাদ্য সংকট তীব্র। নানা ফসল এবং গম উৎপাদন অত্যন্ত কমে যাওয়ায় বাজারে এগুলির দাম বেড়ে গেছে। মানুষের হাতে অর্থ না থাকায় তারা কিনতেও পারছেন না খাদ্যদ্রব্য। স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেছে দারিদ্র এবং অপুষ্টি। শিশু-অপুষ্টি মারাত্মক আকার নিয়েছে। তালিবানি শাসনে লিঙ্গবৈষম্যও (মহিলা-পুরুষ) বেড়ে গেছে মারাত্মক হারে।

আফগানির (আফগানিস্তানের মুদ্রা) অবমূল্যায়নের সাথে সাথে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, ময়দা থেকে শুরু করে ভোজ্য তেল সব কিছুর দাম চড়চড় করে বেড়ে চলেছে। একে মূল্যবৃদ্ধি। উপরন্তু তালিবানি শাসনে মহিলারা ঘরবন্দি থাকতে বাধ্য হওয়ায় কাজে যেতে পারছেন না। ফলে অর্ধাহার-অনাহার এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে।

তালিবানি শাসনে এখানকার বহু বাণিজ্যিক সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও বেতন পাচ্ছেন না। সরকারি নানা দপ্তর, ব্যাঙ্ক প্রায় বন্ধ। দিন আনা দিন খাওয়া হাজার হাজার মানুষের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তালিবান ক্ষমতা দখলের পরে আন্তর্জাতিক অনুদানও বন্ধ হয়েছে আফগানিস্তানে। দেশে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭.৩ শতাংশে। পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে দারিদ্র ও অনাহার।

১৪৬তম শরৎচন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত রাজ্য জুড়ে

মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৬ তম জন্মদিবস উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয় নানা গণসংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।

শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি পালিত হয়। এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমল এবং পথিকৃৎ-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' গল্প দুটি রচনার শতবর্ষ পরেও আজও কেন এত প্রাসঙ্গিক, এই বিষয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল।

সভাপতিত্ব করেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্ত। সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। দক্ষিণ কলকাতায় ২২টি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ যৌথভাবে শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতি নিয়ে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। শরৎ চ্যাটার্জী পার্ক (ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক)-এ আবক্ষ মূর্তিতে অন্যান্যদের সাথে মাল্যদান করেন উত্তরণের সন্ধানে সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যবান কর। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত হাওড়া জেলার দেউলটিতে শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে দেউলটি স্টেশনে শরৎচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

পানিত্রাসে এই মহান সাহিত্যিকের বাসভবনে আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন কমিটির সভাপতি আশিস বন্দোপাধ্যায়। সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির সহসভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া। সঞ্চালনা করেন সম্পাদক অমলেন্দু পাঁজা।

'ব্যাড ব্যাঙ্কের' নামে একচেটিয়া মালিকদের ঋণ মকুব ঃ প্রতিবাদ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের

২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী ২ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা অর্থনীতির নতুন টোটকা 'ব্যাড ব্যাঙ্ক' বা ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (এনএআরসিএল)-এ সিলমোহর বসাল। এটি ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ আদায়ের নামে এক প্রতারণামূলক পদক্ষেপ। এই নতুন সংস্থা ব্যাঙ্কের খাতায় থাকা সমস্ত অনাদায়ী ঋণ বা অনুৎপাদক সম্পদের কাগজপত্র হাতে তুলে নেবে। ফলে ব্যাঙ্কের খাতা থেকে অনাদায়ী ঋণ মুছে যাবে। ব্যাঙ্ক নতুন করে ঋণ দেওয়ার জায়গায় চলে আসবে। নিয়ম অনুযায়ী উক্ত সংস্থা ১০০ টাকার অনাদায়ী ঋণের কাগজপত্র হাতে নিলে প্রথমেই ব্যাঙ্ককে ১৫ টাকা মিটিয়ে দেবে। বাকি ৮৫ টাকার জন্য গ্যারান্টি হিসেবে রসিদ দেওয়া থাকবে। তারপর কর্পোরেট সংস্থার থেকে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের চেষ্টা হবে। একান্তই সম্ভব না হলে বন্ধক রাখা সম্পত্তি নিলামে তুলে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা হবে। ৮৫ টাকার মধ্যে যতখানি অর্থ উদ্ধার করা যাবে না, তার জন্য সরকার দায়বদ্ধ থাকবে।

এর ফলে সরকার একদিকে যেমন কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে ঋণ পরিশোধ করার দায় থেকে মুক্তি দিতে চাইছে, তেমনি ব্যাঙ্ক গুলিকে এনপিএ মুক্ত করে বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করতে চাইছে। এখানে প্রশ্ন হল, ব্যাঙ্কগুলির পক্ষ থেকে কর্পোরেট সংস্থাগুলির থেকে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের চেষ্টা করার সমস্যা কোথায়? কিংবা বন্ধক রাখা সম্পত্তি নিলামে তুলে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করারই বা বাধা কোথায়? এতদিন এ কাজ তো ব্যাঙ্কই করত। এখন ঘুরিয়ে নাক দেখানো কেন? তাছাড়া ব্যাড ব্যাঙ্কের দ্বারা যতখানি অর্থ উদ্ধার করা যাবে না তার দায়িত্ব সরকার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। এজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গ্যারান্টি বাবদ ৩০,৬০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।

বলাবাহুল্য, এই প্রক্রিয়ায় জনগণের করের টাকায় কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে যার ফলে জনস্বার্থে বরাদ্দ কমবে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল।

বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ

পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করছেন দলের কর্মীরা

কাঁসাই নদীবাঁধ মেরামতের দাবি সেচ দপ্তরে বিক্ষোভ

নিউ কাঁসাই অববাহিকার ময়না ও তমলুক ব্লক এলাকায় নদীবাঁধ জরুরি ভিত্তিতে মেরামত, পাঁশকুড়া-ময়না সংযোগকারী প্রজাবাড়ে কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করা, সিডিউল অনুসারে নদী খননের অবশিষ্ট কাজ বর্ষার পরই শুরু করার দাবিতে ১৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির ময়না ও তমলুক ব্লক শাখার উদ্যোগে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সেচ দপ্তরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। তমলুক শহরের জেলখানা মোড় থেকে মিছিল সেচ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়।

অলিম্পিকে সাফল্য ক্রীড়াবিদদের ব্যক্তিগত সংগ্রামের ফল

সরকারের ভূমিকা শূন্য

স্বাধীনতা ৭৪ বছর পর পদকের হিসাবে 'টোকিও অলিম্পিক'ই ভারতের সেরা অলিম্পিক। মোট সাতটি পদক জিতেছে ভারত। এর আগে ২০১২-তে মোট ৬টি পদক জিতেছিল। এবার 'জ্যাভলিন থ্রো'তে সোনা জেতার সঙ্গে সঙ্গে নিরজ চোপরা 'ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে' প্রথম ভারতীয় পদক বিজয়ী হিসেবে নিজের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে ফেললেন। রুপোজয়ী মীরাবাঈ চানু, ববি দাহিয়া এবং ব্রোঞ্জজয়ী পিভি সিন্ধু, লাভলিনা বরগোঁহাই, বজরং পুনিয়ার কৃতিত্বও কোনও অংশে কম নয়।

কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে বারবার উঠে আসছে পুরুষ ও মহিলা হকি দলের সফলতার কথা। পুরুষ হকিতে সেই ১৯৮০ সালের পর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের খরা কাটিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। সেমিফাইনালে হেরে পদক না পেলেও ভারতীয় মহিলা হকি দলের ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই সফলতায় প্রতিটি ক্রীড়াপ্রেমী গর্বিত। পরবর্তীকালে প্যারা অলিম্পিকেও ভারতীয় প্রতিযোগীরা বেশ কিছু পদক জিতেছেন। প্রতিযোগীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এই প্রশ্ন বারবার ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমী জনগণকে ধাক্কা দেয় যে, সামগ্রিকভাবে কেন ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থা?

স্বাধীনতার পর অলিম্পিকে এ পর্যন্ত ভারত যতগুলো সোনা জিতেছে (৭টি) বিশ্বখ্যাত সাঁতারু মাইকেল ফেলপস তার থেকে অনেক বেশি জিতেছেন একাই (২৩টি)। ১৯৪৮ এর লন্ডন অলিম্পিকে এক স্মরণীয় ফুটবল খেলেছিল সদ্য স্বাধীন দেশ ভারত, বুটের বিরুদ্ধে খালি পায়ে। ১৯৫৬-র অলিম্পিকে ফুটবলে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল ভারত। ১৯৫১ আর ৬২-র এশিয়ান গেমসে সোনা আর ১৯৭০-এ ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। ১৯৬৪তে এএফসিক্সর এশিয়া কাপে ভারত রানার্স হয়েছিল। এরপর যত দিন গড়িয়েছে ফুটবলে তত পিছিয়েছে ভারত। এখন আমরা রাত জেগে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার খেলা দেখি। পরাধীন ও সদ্য স্বাধীন ভারত যে হকিতে ছিল বিশ্বসেরা তাতেও দীর্ঘ ৪০ বছর পর পদক এল! 'ট্রাক এন্ড ফিল্ড' স্বাধীনতার ৭৪ বছরে এই প্রথম সোনা জিতল ভারত! কেন এই অবস্থা?

খেলাধূলার জগতে সাফল্য পেতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে আন্তরিক ও নিরলস প্রয়াসী হতে হয়। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে আনার জন্য চাই তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পরিকল্পিত পদক্ষেপ। দরকার সেই সমস্ত দক্ষ মানুষের যাঁরা খেলাটা জানেন, চেনেন এবং বোঝেন। যাঁরা খেলাটাকে ঠিক পথে এগিয়ে নিয়েযেতে পারবেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় এগোতে হলে প্রয়োজন প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো। কিন্তু খেলাধূলার উন্নতিতে সরকারের না আছে কোনও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, না আছে পরিকাঠামো সহ নানান বিষয়কে ঢেলে সাজানোর কোনও ভাবনা।

একসময় ভাবা হয়েছিল দেশের বিশেষ কিছু অঞ্চল আছে যেখানে একটি বিশেষ ধরনের খেলার প্রতিভা সহজাত, অন্য অঞ্চলের কাউকে অনেক কঠোর পরিশ্রম করে সেইখেলার কলাকৌশল রপ্ত করতে হয়, সেই সমস্ত অঞ্চলগুলিকে সেই বিশেষ ধরনের খেলার প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে ও বিকাশে জোর দেওয়া হবে। যেমন, উত্তর ভারতে কুস্তি, জ্যাভলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো, শটপাটের মতো বিভিন্ন ফিল্ড গেম সহজাত। উত্তর-পূর্ব ভারত, লাদাখ ও মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চলে তীরন্দাজি সহজাত। দক্ষিণ ভারতে অল্প দূরত্বে দৌড় আর রাজস্থান সহ ভারতের পশ্চিম উপকূলে ও মহারাষ্ট্র-গুজরাটের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ লং ডিস্টেন্স রান ভালো পারে। এইরকম ভাবে নানা এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছিল সহজাত প্রতিভা তুলে আনার জন্য। কিন্তু সেই পরিকল্পনা খুব একটা বাস্তবায়িত হয়নি।

কোনও খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাল ফল করলে সেই খেলোয়াড়কে আর্থিক সহ নানান পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয় ঠিকই, কিন্তু খেলাধূলার উন্নতিতে সরকারের কিছু সদর্থক ভাবনা পরিলক্ষিত যে হয় না তা খেলার বাজেটের দিকে তাকালেইবোঝা যায়। ভারতে তিনটি স্পোর্টস সংস্থা স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনালস্পোর্টস ফাউন্ডেশন এবং নরেন্দ্র মোদির সাধের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্প। এই সংস্থাগুলির ২০১৫-১৬, ১৮-১৯, ২০-২১, ২১-২২ সালের সরকারি অর্থ বরাদ্দের দিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে খেলাধূলার উন্নতিতে সরকারের কোনও ভাবনাই নেই। কখন বাজেট বাড়বে, কখন কমবে, কেন বাড়ানো হচ্ছে, কেনই বা কমানো হচ্ছে? এর সঙ্গে খেলার কোনও সম্পর্ক নেই।

সংস্থার নাম	১৫-১৬	১৮-১৯	২০-২১	২১-২২
সাই	৪০৭	৩৫৫	৫০০	—
এনএসএফ	৩৫০	—	২৪৫	২৮০
খেলো ইন্ডিয়া	৯৭	—	৮৯০	৬৫০

(টাকার অঙ্ক কোটিতে)

আবার বাজেটে যা বরাদ্দ করা হয় তার সিংহভাগই খরচ হয়ে যায় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মচারী-অফিসার-স্টাফ-কোচ সহ সবার মাইনে দিতে, নতুন স্টেডিয়াম তৈরি ও পুরনোকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, জার্সি-ফুটবল-ভলিবল সহ খেলার নানান সামগ্রী কিনতে। ফলে প্রতিভা খুঁজে বের করা, তাকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় গড়ে তোলার মতো ধারাবাহিক বিষয় যা শুরু হয় একদম স্কুল থেকে তার জন্য কোথায় অর্থ আর কোথায় পরিকল্পনা! ভারতের মহিলা হকি টিম যে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথম সেমিফাইনালে পৌঁছলো সেই অস্ট্রেলিয়ায় একটা হকি স্টেডিয়ামে যে টাকা খরচ করা হয় সেই টাকা ভারতে পুরো খেলায় খরচ হয়! ভারতের মহিলা হকি দল একের পর এক যে সমস্ত দেশকে হারিয়ে সেমিফাইনালে গেছে সেই সব দেশে একজন খেলোয়াড়ের পিছনে যে খরচ হয় সেই খরচ এখানে পুরো দলের পিছনেও করা হয় না! আমাদের দেশে খেলোয়াড় তৈরি হয় সরকারি পরিকাঠামোয় নয়, ব্যক্তিগত সংগ্রাম, লড়াই-আবেগ আর জেদের ফসল হিসাবে।

ভারতের বেশিরভাগ খেলোয়াড় নিম্নবিত্ত গরিব শ্রেণিভুক্ত, আদিবাসী পরিবার থেকে উঠে আসা। পারিবারিক অভাব-অনটন তাঁদের নিত্যসঙ্গী। অনাহার-অর্ধাহারে দারিদ্রে ভরা জীবনে খেলাই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। খেলোয়াড়রা যদি মহিলা হন তা হলে তাদের প্রবল আর্থিক অসুবিধার সাথে সম্মুখীন হতে হয় নানা পারিবারিক-সামাজিক বাধা-বিপত্তির। এমনকি তাদের বাবা-মাকেও শুনতে হয় নানা কটূক্তি। যার বিরুদ্ধে টিকে থাকতে গেলে প্রয়োজন হয় এক কঠিন মানসিকতার। ভোট পেতে যতই স্লোগান দেওয়া হোক 'বেটি বাঁচাও- বেটি পড়াও', যতই সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হোক সি বি এস ই পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের হারিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে, যতই মহিলা বিমানচালক হোক না কেন তাতে মহিলাদের নিয়ে সমাজের অবস্থান, ভাবনা বিন্দুমাত্র বদলায় না। সমাজই ঠিক করে মেয়েদের কী ভাবে চলা উচিত। কী পড়া উচিত। কী করা উচিত? লাভলিনাদের অলিম্পিক পদক জয় তাই সেই সমাজের ওপর একটা বিরাট পাঞ্চ। রানি রামপালদের এই সফলতা তাই দেশের গরিব মানুষের সংগ্রাম বিধ্বস্ত জীবনে সফলতার কাহিনি। এমন নয় যে, এই সফলতায় বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার ন্যূনতম পরিকাঠামো যা তারা দেয় তার বা কোচের কোনও ভূমিকা নেই। এইসবগুলির একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এই সুবিধাগুলো পাওয়ার আগে আমাদের দেশের ক্রীড়াবিদদের সংগ্রাম বিধ্বস্ত এই জীবন উপন্যাসের চেয়ে কম কিছু নয়। তাই তাঁদের জীবনের সফলতা কবিতার মতো সুন্দর, আনন্দদায়ক, অনুপ্রেরণার।

মহিলা হকি দলের অধিনায়ক হরিয়ানার সাহানাবাদের রানি রামপালের বাবা দিনমজুর, মা পরিচারিকা। সংসারের নিত্য অভাব। বিদ্যুৎহীন ঘরে মশা আর মাছির গুনগুনানি। একটু বৃষ্টিতে সেই ঘর আবার জলে ডুবে যায়। এর মধ্যেই বড় হয়ে ওঠা। বাড়ির সামনে হকি একাডেমিতে খেলতে মন চাইতো কিন্তু কোচ নিতে নারাজ কারণ হকির কঠোর অনুশীলন নেওয়ার মতো ক্ষমতা রানির শরীরে নেই। বাবার হকি স্টিক কিনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাই কুড়িয়ে পাওয়া একটা ভাঙা হকি স্টিক দিয়ে সালোয়ার-কামিজ পরে নিজে নিজেই শুরু করলেন অনুশীলন। সেই দেখে অ্যাকাডেমির কোচ তাকে হকি খেলা শেখাতে রাজি হলেন কিন্তু বেঁকে বসল পরিবার। স্কার্ট পরে খেলতে দেবে না, কারণ সমাজ মানবে না। শরীরের পুষ্টির জন্য একটু দুধ খাওয়া দরকার, সবার খাওয়ার পর পড়ে থাকা দুধে জল মিশিয়ে খেত রানি। ২০১৭ সালে যখন পরিবারের জন্য একটা ফ্ল্যাট কিনলেন তখন পরিবারের সবাই পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ছিলো অনেকক্ষণ। ২০১৮ সালের ২৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানালেন আজ দেশের বিকাশ যাত্রার ঐতিহাসিক দিন কারণ ভারতের সব গ্রামে আজ বিদ্যুৎ পৌঁছে গেল। কিন্তু আমরা চমকে গেলাম অলিম্পিকের হকির সেমিফাইনালে দিন, যখন দেখলাম ঝাড়খণ্ডের গ্রাম বড়কি ছাপড়ের সবাই জেনারেটর ভাড়া করে গ্রামের গর্ব সেলিমা টেটের খেলা দেখল। আমরা জানলাম ২০১৮তে প্রধানমন্ত্রী মিথ্যা বলেছিলেন। সোনিপতের নেহা সোহেলের মাতাল পিতা প্রতিদিন তাকে মারধর করতেন। খাবার জুটত না তাই বাধ্য হয়ে মায়ের সাথে সাইকেল কারখানায় চাকায় স্পোক লাগিয়ে ৫ টাকা পেত তা দিয়েই পেট ভরাতো। নিশা বারষির পিতা দর্জি ছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর মা কারখানায় কাজ করে সংসার চালাতেন।

লাভলিনা বরগোঁহাইয়ের মা তিন মেয়ের জন্ম দেওয়ায় পরিবারের লোকজন আর সমাজের তিরস্কার জুটত। ২০১৫ সালে অর্জুন পুরস্কার পাওয়ার সময় যে ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন তা খেলার জন্য নয়, অসুস্থ মায়ের কিডনির চিকিৎসা করাতে খরচ হয়ে যায়। এঁদের মতোই হরিদ্বারের বন্দনা, মিজোরামের লালবেন সিয়ামি, সুশীলা ডি গ্রেস, মনিকা, নবজ্যোৎ, সবিতা, বজরং পুনিয়াদের জীবন সংগ্রাম তাই রূপকথার মতো। এঁরা বুঝেছিলেন যে অভাব-অনটন আর দারিদ্রে ভরা দমবন্ধকরা জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যদি কিছুটা শ্বাস নেওয়ার মতো অবস্থায় যেতে হয় তাহলে খেলাধূলাই হতে পারে একমাত্র মাধ্যম। তাই তারা প্রবল গরিবি আর দুরবস্থার মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিল। এই স্বপ্ন পূরণে কোথাও তারা সরকারকে পাশে পাননি। সরকারের কোটি কোটি টাকার ক্রীড়া বাজেটও এদের জীবনে কাজে আসেনি।

দেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখে এদের স্বপ্ন পূরণের সংগ্রামে কোথাও না থেকে যখন সফলতা আসল তখন তার আলোকছটাকে নিজেদের স্বার্থে নেতা-মন্ত্রীরা প্রচারের কাজে লাগাচ্ছে। দেখাতে চাইছে সরকারের সফলতা হিসাবে। সফল পুরুষ ও মহিলা হকি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী তাই নির্দেশ দিতে ভুলে যান না যে সেই ফোনালাপ যেন ভিডিও তুলে সামাজিক মাধ্যমে ছাড়া হয়। অথচ যখন অর্থের অভাবে হকি দলের অলিম্পিকে অংশগ্রহণ, তার প্রস্তুতি সবই বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল তখন প্রধানমন্ত্রী নিজে যেমন এগিয়ে আসেননি বা তার বন্ধু মুকেশ আম্বানি বা গৌতম আদানিকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। ফোনালাপে যে মহিলা খেলোয়াড়দের কৃতিত্বে প্রধানমন্ত্রী গর্ববোধ করলেন সেই দলেরই খেলোয়াড় তথাকথিত দলিত বন্দনা কাটারিয়ার বাড়ির সামনে সেমিফাইনাল হেরে যাবার পর বাজি ফাটিয়ে

সাতের পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকার ব্যস্ত মালিক তোষণে

একের পাতার পর

মাধ্যমে ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ পালনের আহ্বান করেছেন। সমস্ত কারখানা শ্রমিক, চুক্তি শ্রমিক, অস্থায়ী দৈনিক রোজের কর্মচারী, পরিবহণ কর্মচারী, অফিস কর্মচারী, শিক্ষক, হকার, দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী সহ সমস্ত স্তরের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে তাঁরা আবেদন করেছেন— এই বনধকে সর্বাত্মক করুন। সরকারের চোখের উপর চোখ রেখে ওই একটা দিনের জন্য সব কিছু স্তব্ধ করে দিন। বিজেপি সরকারের তিন কৃষি আইন, নতুন বিদ্যুৎ আইনের বিরোধিতায় নেমেছেন তাঁরা। সংসারে প্রতিদিন হেঁসেলটাই চলবে কি না যখন প্রশ্ন, তার উপর আবার একটা বনধ ডাকছেন কৃষকরা, সমর্থন করবেন সব পেশার খেটে খাওয়া মানুষ! এ কি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো নয়? বাজারে দামের ছ্যাঁকা খেয়ে অস্থির পরিবারগুলির কাছে এই সব আইনের কচকচির মূল্য কী?

একটু খতিয়ে দেখা যাক। বাজারে আজকাল গেলেই দেখবেন সরষের তেল বলুন, আটা বলুন, চাল বলুন সব কিছুই বিক্রি হচ্ছে প্যাকেটবন্দি। আপনি খুচরো তেল, আটা, চাল চাইলে বহু সময় পাবেনই না। পাড়ার মুদির দোকানে যদি বা পান, তার গুণমানও দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ফলে কিনতে হবে ওই প্যাকেটই। তার কোনওটা আদানি গোষ্ঠীর ফরচুন, কোনওটা বা আম্বানিদের মালিকানার রিলায়েন্সের ছাপধারী, কোনওটা বা স্বনামধন্য আইটিসি-র, কেউ বা টাটাদের তকমা নিয়ে দোকান আলো করছে। দাম? খুচরো জিনিসের দামের চেয়ে ওই সব প্যাকেটের দামের ফারাক ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অন্য দিকে শপিং মল কাগজের পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে সপ্তাহে একদিন করে বিপুল ছাড়ে নিয়ে যান— ঘরের যা লাগবে তার সব কিছু। কারা চালাচ্ছে ওই সব মল? যাদের নাম বলা হল প্যাকেটবন্দি মুদিখানা সামগ্রীর জন্য, সেই সব বৃহৎ পুঁজি মালিকরাই আবার শপিং মলের মালিক। খুচরো ব্যবসা দখল করার জন্য একচেটিয়া মালিকদের কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। ফলে সাধারণ তেলকল, ধানকল, ফসল ব্যবসায়ী, আটাচাকির দোকানদাররা যে ব্যবসা করতেন তা ক্রমাগত লাটে উঠছে। জায়গা নিচ্ছে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। বিরাট বিরাট একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা এখন কৃষিপণ্যের ব্যবসায়। তারা কৃষিপণ্যের চাষে টাকা ঢালছে, ইতিমধ্যেই শত শত একর জমি নিয়ে গুদাম, সংরক্ষণের নানা ব্যবস্থাও তারা করে ফেলেছে।

কৃষিপণ্যের ব্যবসায় একচেটিয়া দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফা সুনিশ্চিত করতেই বিজেপি সরকার এনেছে তিনটি কৃষি আইন। এর একটি হল চুক্তি চাষের আইন। যে আইন চাষিকে ইতিমধ্যেই বাধ্য করতে শুরু করেছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মর্জিমাফিক চাষ করতে, তাদের দরেই ফসল বেচতে। তাই সরষে চাষি যত সামান্য দরই পাক, টমেটো চাষি প্রতি কিলোতে এক টাকা বা তার কমই পাক, এই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে বাজারে তা অগ্নিমূল্য। চালু হয়েছে কৃষি ফসলের আগাম লেনদেনের ব্যবস্থা। মাঠে ফসল থাকতে থাকতেই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার কেনাবেচার মতো অনলাইনে ফসলের দাম নিয়ে ফাটকা নিলাম হাঁকছে। ফলে মাঠের ফসল কৃষক যেমন ব্যবসায়ীদের বেঁধে দেওয়া দরেই বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, সেই ফসলই বহুজাতিক কোম্পানির গুদাম ঘরে প্যাকেট বন্দি হয়ে আগুন দামে পৌঁছচ্ছে ক্রেতার হাতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধন করে বলেছে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য, ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, আলু ইত্যাদির দাম যত খুশি বাড়াক, সরকার ব্যবস্থা নেবে না।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে ডিজেলের মারাত্মক দামবৃদ্ধি। চাষ এখন বহু দিক থেকে যন্ত্রনির্ভর। ট্রাক্টর, হারভেস্টরের মতো যন্ত্র ভাড়া না করে সাধারণ চাষিরও চলছে না। তেলের দাম বাড়লে তার ভাড়া বাড়ে লাফিয়ে। বাড়ে সেচের পাম্পের খরচ। একই সাথে বিপুল হারে বাড়ে পরিবহণের খরচ। বিদ্যুতের দাম যেভাবে বেড়েছে তার ফলে সেচের বিদ্যুতের দাম যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে হিমঘরের ভাড়া। যা জোগানো অসম্ভব বলে বহু ক্ষুদ্র চাষিকে মাঠ থেকেই ফসল দিয়ে দিতে হচ্ছে বৃহৎ কোম্পানির এজেন্টদের হাতে। আর এর প্রত্যেকটির ধাক্কা যেমন গিয়ে পড়ছে একেবারে সাধারণ চাষির উপর, তেমনই নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থের উপর। এর উপর বিদ্যুৎ আইনের নতুন সংশোধনী যেমন বিদ্যুতের দাম বাড়াবে, একই সাথে বাড়াবে কৃষিপণ্য সহ সমস্ত কিছুর দাম। সর্বনাশা কৃষি আইন, বিদ্যুৎ আইনের নতুন সংশোধনী অগণিত গরিব মধ্যবিত্ত সংসারের ভাতের থালাটুকুও কেড়ে নেবে। আপনার বড় আদরের সন্তানের পাতে দুটো ভাত ঠিকমতো দিতে হলেও আজ দাঁড়াতে হবে কৃষকদের এই সংগ্রামের পাশে।

বন্ধ হতে বসা হেঁসেলের চুলাটুকু জ্বালিয়ে রাখতে হলেও এই একটা দিন কল-কারখানা, অফিস-কাছারি, যানবাহন, হাট-বাজার সব কিছু বন্ধ করে বিজেপি সরকারের নির্লজ্জ মালিক তোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা দরকার। এই বনধে সামিল হতেই হবে।

মার্কিন দখলদারি

তিনের পাতার পর

জনগণের কর্তব্য কী?

রাওয়া ঃ আমরা ভাগ্যবান এবং খুশি। কারণ, এই বছরগুলিতে আমেরিকার স্বাধীনতাকামী জনগণকে আমরা পাশে পেয়েছি। আমরা চাই আমেরিকার জনগণ তাদের সরকারের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করুক। এর মধ্য দিয়েই বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জনগণের লড়াইকে সাহায্য করা যাবে।

... শান্তিকামী, প্রগতিশীল, বামপন্থী এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকা প্রতিটি ব্যক্তি ও সংগঠনের কর্তব্য হোয়াইট হাউস, পেন্টাগন ও ক্যাপিটল হিলে বসে থাকা নির্মম যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্রতর করা। এই পচে যাওয়া ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ন্যায় এবং মানবতার অভিমুখে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা শুধু দরিদ্র, শোষিত মার্কিন জনগণকে মুক্তি দেবে না, তার প্রভাব পড়বে সারা দুনিয়ার প্রতিটি কোণে।

আমরা আফগানিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন ও নারীর অধিকারের লক্ষ্যে আমাদের কণ্ঠস্বরকে জোরদার করব, সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলব।

আবার অনাহারের কালো ছায়া পুঁজিবাদী রাশিয়া, ইউক্রেনে

রাশিয়ায় প্রতি পাঁচ জন মানুষের মধ্যে দু'জনের গত ছ'মাস ধরে ভরপেট খাবার জুটছে না। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই ভয়ানক তথ্য। লেভাডা সেন্টার নামক সংস্থার এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, ভয়াবহ দামবৃদ্ধির কারণে দেশের ৩৯ শতাংশ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারছেন না। ৫২ শতাংশ মানুষ খাবারটুকু জোগাড় করতে পারলেও জামাকাপড় কিংবা জুতোর মতো দরকারি জিনিসগুলি কেনা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় মানুষের নিত্যসাথী ছিল গরিবি আর অনাহার। ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে দেশের সমস্ত মানুষকে জীবনধারণের মূল তিনটি প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান জোগানোর দায়িত্ব নিয়েছিল রাষ্ট্র। অসুস্থ হলে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেত মানুষ। শিক্ষা ছিল সর্বজনীন। দূর হয়েছিল বেকার সমস্যা। দেশ থেকে মুছে গিয়েছিল গণিকাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি।

ত্রিশ বছর পার হয়ে গেল, সমাজতন্ত্র ভেঙে দিয়ে আবার ফিরে এসেছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। দেশের মানুষের চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের তৎকালীন প্রধান মিখাইল গর্বাচেভের নেতৃত্বে জয়লাভ করেছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। অল্প কয়েকটি ধনকুবের গোষ্ঠী কুক্ষিগত করেছে প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি। ফিরে এসেছে মানুষের ওপর মানুষের শোষণের মধ্য দিয়ে মুনাফা তৈরির ব্যবস্থা। সমীক্ষা দেখাচ্ছে, তারই সাথে রাশিয়া সহ সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতে ফিরে এসেছে অনাহার-গরিবির সেই পুরনো কালো ছায়া।

সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত আরেকটি দেশ ইউক্রেনেরও আজ একই অবস্থা। রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা ইউনিসেফের একটি সমীক্ষা দেখিয়েছে, ইউরোপের সমস্ত দেশগুলির মধ্যে আজ পুঁজিবাদী ইউক্রেনেই সবচেয়ে বেশি খেতে-না-পাওয়া মানুষ বাস করেন। পয়সা জোটাতে না পেরে সেখানকার ১১ লক্ষ বাসিন্দা হয় না-খেয়ে, নয়ত কম খেয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

মনীষী স্মরণে কমসোমল

শরৎচন্দ্র-বিদ্যাসাগর এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঘাযতীন, যতীন দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্মরণ দিবস উপলক্ষে ১৩ সেপ্টেম্বর কিশোর সংগঠন কমসোমলের কোচবিহার জেলার উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায় স্কোয়ারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক কমসোমল কর্মী সহ উপস্থিত ছিলেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী।

অলিম্পিকে সাফল্য

ছয়ের পাতার পর

উদযাপন, নাচানাচি করে, বর্ণবাদী কটূক্তি করে উচ্চবর্ণের একদল যুবক। দলিত হওয়ার জন্য তাকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে দেখিনি এই ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে একটা শব্দ খরচ করতে! তিনি কোনও এক আশ্চর্য কারণে সম্পূর্ণ নীরব।

ভারত সরকার অলিম্পিকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট চালু করে। সেখানে না আছে কোনও প্রথিতযশা খেলোয়াড়ের ছবি, না আছে ক্রীড়াদপ্তরের নাম। শুধু মোদি আর মোদি। ওয়েবসাইটে প্রচারের সঙ্গে দেশের যুবকদের যুক্ত করার জন্য অনেক ছবি টুইট করা হয় যাতে খেলোয়াড়দের ছবি নয় শুধু মোদি আর যোগীর ছবি। অলিম্পিক নিয়ে সরকারের ও সরকারি দলের এই চর্চায় শুধু বিজেপি আর মোদি ছাড়া কিছু নেই। অলিম্পিক পদকজয়ী খেলোয়াড়দের হয়ত নানা পদক, নানা খেতাবে ভূষিত করা হবে, দেওয়া হবে অর্থসাহায্য কিন্তু তাতে যদি আমরা ভাবি দেশের খেলাধূলার উন্নতি বা বিকাশে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি আর তার নীতির পরিবর্তন হবে তা হলে আমরা ভুল করব। পদক জয়ীদের এই সম্মানে ভূষিত সরকারকে করতে হয় না হলে তার মুখোশটা খসে পড়বে। কিন্তু পরদিন থেকেই সেই কৃতী খেলোয়াড়দের কী হল তার বিন্দুমাত্র খবর কেউ রাখবে না। প্রকৃতপক্ষে খেলোয়াড়দের এই সাফল্য তাঁদের জীবনযন্ত্রণা ও দীর্ঘশ্বাস থেকে জন্ম নিয়ে ঝড় তুলেছে অলিম্পিকের যুদ্ধে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বনধের সমর্থনে দেশ জুড়ে প্রচার

কৃষ্ণপুর বাজার, কলকাতা

শিয়ালদহ, কলকাতা

শিববিহার, দিল্লি

পুরুলিয়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল(সংশোধনী) ২০২১ বাতিলের দাবিতে ১৯ সেপ্টেম্বর অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র রঘুনাথপুর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ব্লক বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন। রঘুনাথপুর শহরের বরাট লজে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে বিদ্যুৎ বিলের নানা জনবিরোধী দিক তুলে ধরে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বনধ পালনের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন নাগ।

বক্তব্য রাখেন পুরুলিয়া জেলা কমিটির সহ সভাপতি শৈলেন বাউরী, বিপিন মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথপুর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।

কৃষি জমি বাঁচাও কমিটির বিক্ষোভ মেছিতে

দার্জিলিং জেলার অর্ন্তগত মেছি কৃষি জমি বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এয়ারভিউ মোড় থেকে এসডিও অফিসে মিছিল করে যাওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি হরদেন মল্লিক ও সহ সভাপতি জয় লোধ। তাদের দাবি, কোনও অজুহাতে তাদের কৃষি জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না, সকল কৃষকদের জমির পাট্টা দিতে হবে, কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ বাহাদুর, ববিতা মল্লিক, সত্য নারায়ণ, দীনবন্ধু মল্লিক প্রমুখ।

টেলিকম ক্ষেত্র বিদেশিদের কাছে পুরোপুরি খুলে দিল সরকার

বিরোধিতা এসইউসিআই(সি)-র

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, টেলি-যোগাযোগ ক্ষেত্রে সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়াই সরাসরি ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগে অনুমতি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে, আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। এই সিদ্ধান্তের ফলে পুঁজি লগ্নির পর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে জানালেই চলবে, সরকারের কাছ থেকে লগ্নির জন্য আগাম অনুমতি নিতে হবে না। অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে আমরা আরও লক্ষ করছি, ক্রমাগত দরিদ্র হতে থাকা সাধারণ মানুষের ওপর যে সরকার পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে চলেছে এবং সরকারি সংস্থা বিএসএনএল-কে ছক কষে দুর্বল করছে, সেই সরকারই আবার ব্রিটিশ সংস্থা ভোডাফোনের ৫০,৩৯৯.৬৩ কোটি টাকা বকেয়া কর শোধের ক্ষেত্রে চার বছরের জন্য স্থগিতাদেশ দিল। পাশাপাশি এই সরকার 'গভীর ও বিস্তৃত' সংস্কারের অজুহাতে ভারতী এয়ারটেল, রিলায়্যান্স জিও এবং ভোডাফোন আইডিয়ার মতো বৃহদাকার বেসরকারি টেলি-যোগাযোগ সংস্থাগুলিকে সাহায্য করতে 'এয়ারওয়েভ' বাবদ প্রাপ্য টাকা পরিশোধের ওপরেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

টেলি-যোগাযোগ ক্ষেত্রটিকে দেশি ও বিদেশি বেসরকারি একচেটিয়া সংস্থার সামনে মুনাফা লুটের জন্য সম্পূর্ণ খুলে দেওয়ার এই সরকারি পদক্ষেপের পরিণতিতে টেলিফোন-মাশুল চড়া হারে বৃদ্ধি পাবে, যার বোঝা এসে পড়বে সেই সাধারণ মানুষেরই কাঁধে। দুর্দশা-জর্জরিত দেশবাসীর কাছে আরও একবার আমরা বিজেপি সরকারের কর্পোরেট স্বার্থবাহী জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদের এই লাগাতার অর্থনৈতিক আক্রমণ রুখে দিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

কর্ণাটকের নানজাগুরে জমিহারাদের আন্দোলনের জয়

কারখানায় কাজ দেওয়া হবে এই শর্তে কর্ণাটকের নানজাগুরের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করেছিল এশিয়ান পেন্টস কর্তৃপক্ষ। কারখানা হয়ে যাওয়ার পর কাজ দেওয়া বা উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে কারখানা কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে। এর প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি সহ নানা সংগঠনের নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলনে নামেন গ্রামবাসীরা।

জমি অধিগ্রহণের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে কারখানা কর্তৃপক্ষ জমিহারা পরিবারের সদস্যদের গ্রাম থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরের স্যানিটাইজার উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ দেওয়ার কথা জানায়। অনেকবার বৈঠক করেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এরপর গ্রামবাসীরা এআইইউটিইউসি সহ অন্যান্য কিছু সংগঠনের যৌথ নেতৃত্বে কারখানার গেটে লাগাতার ধরনা শুরু করে। ৫০ দিন ধরনা চলার পরও কর্তৃপক্ষ দাবি মানতে রাজি হয়নি। ফলে কোম্পানির সমস্ত গেট অবরুদ্ধ করে রাখে কৃষকরা। লাগাতার অবরোধে কোম্পানির উৎপাদন এবং পরিবহণ সমস্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ জমিহারাদের কাজ দেবে বলে ঘোষণা করে। অবরোধ তুলে নিলেও নিয়োগপত্র না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা ধরনা অব্যাহত রাখে। অবশেষে আন্দোলনের সম্পূর্ণ জয় হয়। জমিহারা পরিবারগুলির ৬০ জন সদস্যকে কারখানা কর্তৃপক্ষ কাজ দিতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলন এলাকায় এআইইউটিইউসি সম্পর্কে গভীর আস্থা সৃষ্টি করে।

কর্ণাটকে ৬ মাস ধরে লাগাতার ধরনায় শ্রমিকরা

কর্ণাটকের এক বহুজাতিক ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির ৭২ জন শিক্ষানবিশ এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক গত ৬ মাস ধরে লাগাতার ধরনায় সামিল হয়েছেন। এঁরা শিক্ষানবিশ এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে গত ১০ বছর ধরে এই কোম্পানিতে কাজ করছেন। এতদিন ধরে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজে লাগানো শ্রম আইনের পুরোপুরি বিরোধী। তা সত্ত্বেও এই অঞ্চলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি শ্রম আইন চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করছে এবং নানা অনৈতিক কাজ করে চলেছে। কর্তৃপক্ষ অন্যত্র কোম্পানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়ায় ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতাকেই সমর্থন করছে। সরকার ও কর্তৃপক্ষের এ ধরনের আচরণে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা স্থায়ী করার দাবি জানিয়ে শ্রমদপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। বিষয়টি পরে লেবার কোর্টে যায়। এতে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের উপর ক্ষুব্ধ হয়।

ইতিমধ্যে লকডাউনের অজুহাত দিয়ে কর্তৃপক্ষ শিক্ষানবিশদের ছাঁটাই করে। কোম্পানিতে বড় বড় ট্রেড ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও তারা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়নি। অবশেষে এআইইউটিইউসি সহ অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলনে নামে শ্রমিকরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে শ্রমিকরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। এই আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যে এআইইউটিইউসি সম্পর্কে আস্থা জাগিয়েছে। অন্যান্য বহু কোম্পানির শ্রমিকরা দাবি আদায়ের জন্য এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ইউনিয়নে সামিল হচ্ছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com